চতুর্থ অধ্যায়

"সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ ও সমসাময়িক বাংলা ঔপন্যাসিক"

দেশভাগ পরবর্তী বাংলা সাহিত্যে একজন সফল ঔপন্যাসিক হলেন সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ (১৯৩০ ২০১২)। তবে গল্পকার হিসেবেও তিনি আলাদা সম্ভ্রমের দাবী রাখেন। 'ইবলিশ' ছদ্মনামে প্রকাশিত তাঁর প্রথম রচনা 'কাঁচি' (বহরমপুর, 'সুপ্রভাত' পত্রিকায়)। বিশিষ্ট গদ্যকার হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন 'অমৃত' পত্রিকায় 'সীমান্ত থেকে ফেরা' (১৯৬২) প্রকাশিত হবার পর থেকে। ১৯৬৩ সালে সাপ্তাহিক 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত 'ভালোবাসা ও ডাউন ট্রেন' নামক গল্পে তাঁর প্রখর প্রতিভার স্বাক্ষর মেলে। গ্রাম ও শহরের বৈচিত্র্যময় মানুষ তিনি দেখেছেন; শুনেছেন তাদের হাসি ও কান্না। যে অদৃশ্য তাঁতি আমাদের জীবনের তাঁতে সাদা-কালো বা রঙিন সুতো বুনে চলেছেন তার খবর তিনি দিয়েছেন। কখনো তিনি নিজে বক্তা, কখনো চরিত্রের ঘটনার ব্যাখ্যাকর্তা। শেষপর্যন্ত সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ মানুষের রক্ত-মাংসের চেহারাকে, হৃদয়ের রক্তমাখা শিরাকে ধরতে চেয়েছেন। পৈতৃক সূত্রে প্রাপ্ত মার্কসবাদী চিন্তা-ভাবনা সিরাজের কথা সাহিত্যের আঙিনাতে মাঝে মাঝে এসেছে। আসলে তিনি ছিলেন গভীর জীবনবাদী। বিস্তৃত জীবনের পরিসরে ঘটে যাওয়া অজস্র ঘটনাগুলিকে তিনি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করেছেন। আর সেই পর্যবেক্ষণীর নিগূঢ় বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে তাঁর উপন্যাসে। তাঁর উপন্যাসের বিষয়বৈচিত্র্য ও অভিনবত্ব, লোকজীবনের বিভিন্ন দিক, নাগরিক জীবনের কুটিলতা, সংস্কার-কুসংস্কার প্রভৃতি বিষয়গুলি উপন্যাসে ঘুরে ফিরে এসেছে।

বাংলা কথাসাহিত্যের ধারায় সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ প্রকৃত অর্থে একজন 'অলীক মানুষ'। সাহিত্য প্রতিভা, অভিজ্ঞতা ও গভীর জীবনবোধের সমন্বয়ে তিনি যে নিজস্বতার স্বাক্ষর রেখে গেছেন গল্প-উপন্যাসে তা প্রশংসার অতীত। গল্প এবং উপন্যাস মিলিয়ে সিরাজের রচনা কম নয়। বেশ কয়েকটি উপন্যাস উচ্চ প্রশংসিত এবং পুরস্কৃত। তাঁর উপন্যাসের জগত বিচিত্রময়। সেই অভিজ্ঞতা তথা অনুভব সঞ্চিত হয়েছিল মুর্শিদাবাদের গ্রাম, প্রকৃতি ও মানুষের জীবনচর্যা

থেকে। সিরাজের আত্মকথা থেকে জানা যায় যে তিনি শৈশবের প্রতি মাত্রাধিক দুর্বল ছিলেন—"আমাদের গ্রাম খোশবাসপুর থেকে নেমে গেলে দ্বারকা নদীর বিস্তীর্ণ অববাহিকা। চাষাবাদ হত না। উলুকাশের জঙ্গল। খাগরি মানে ছোট ছোট নালার মতো আর বিল। বই ফেলে রাখালদের সঙ্গে ঘুরে বেড়ানো—এই হচ্ছে স্বাধীনতার আনন্দ।"[১] সিরাজের অধিকাংশ উপন্যাস জুড়ে আছে এই প্রকৃতি এবং তার মানুষের কথা। প্রসঙ্গত বলা দরকার মুর্শিদাবাদের মাঠ, বিল, উদ্ভিদের বিবরণ পাওয়া যায় সাহিত্যিক অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনায়—"হাঁটতে হাঁটতে সে মাঠের আমগাছগুলোর নিচে চলে এসেছে। কি নিলুম! ...দূরে স্টেশনবাড়িটা শুধু জেগে আছে। ...তারপর হিজলের বিল। শেষ নাই তার। সে হিজলের জল পাঁচ বছরে মাত্র একবার পার হয়েছিল। দশ মাইলের ওপর বিলটা। যেন শেষ নাই। গ্রীষ্মে নদীনালায় কিছু জল থাকে—তারপরে খাঁ খাঁ প্রান্তর। খড়ের বন-মাঠ তামাটে রঙের হয়ে যায়। ...বর্ষায় তার রূপ ভৈরবী। দু-পাশের গ্রামগঞ্জ ঘেরি বন্যায় কখনো ভাসিয়ে নিয়ে যায়।"[২] অতীনের গল্পের ভুবনে প্রকৃতির আমেজ থাকলেও সেখানে মানুষের অন্তর্গত শোক, দুঃখ, হতাশা, বেদনা ও স্মৃতির ক্ষরণ অধিক চিত্রিত হয়েছে। আর সিরাজের উপন্যাসে প্রকৃতির সঙ্গে বর্ণিত হয়েছে হিংসা, কামনা-বাসনা, হত্যা ও প্রতিহননের কাহিনী। তাঁর কথায়—"যে অঞ্চলে আমার বেড়ে ওঠা, সেখানকার মানুষেরা খুব দুর্ধর্ষ ছিল। ভীষণ খুনে ছিল। খুন-খারাপি দেখতে দেখতে মানুষ হয়েছি। এই হত্যা, হিংসা দেখে দেখে আমি নির্লিপ্ততার পাঠ প্রকৃতি থেকেই পেয়েছি।"[৩]

অতীন বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯৩৪-২০১৯) দেশ ভাগের ফলে বাঙালির শেকড় হারানো নানা সংকটময় দিনগুলির কথা উল্লেখ করেছেন তাঁর উপন্যাসে। তাঁর উল্লেখযোগ্য উপন্যাসগুলো হল—'সমুদ্র মানুষ' (১৯৬০), 'সমুদ্র পাখির কান্না' (১৯৬১), 'একটি জালের রেখা' (১৯৬২), 'শেষ দৃশ্য' (১৯৬৪), 'মানুষের ঘরবাড়ি' (১৯৭৮), 'ঈশ্বরের বাগান' (১৯৭৮), 'নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে' (১৯৭১), 'অলৌকিক জলযান' (১৯৭৫), 'মানুষের হাহাকার' (১৯৮১), 'নগ্ন ঈশ্বর' (১৯৮৪) প্রভৃতি। অতীনের লেখা সবচেয়ে জনপ্রিয় উপন্যাস হল 'নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে'। ছিন্নমূল মানুষের সঙ্গে রাষ্ট্রের, ব্যক্তির দ্বন্দ্বময় জীবন যাপন উপন্যাসগুলিতে নতুন ভাবে দেখা দিয়েছে।

'নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে' উপন্যাসটির পটভূমিতে রয়েছে পূর্ববঙ্গের একটি গ্রামের স্মৃতি, দেশ-বিভাগ, হিন্দু-মুসলমানের সম্পর্ক, জমিদার প্রথার সম্পর্ক, আর সেই অতীতকে ফিরে না পাবার বেদনাই উপন্যাসটির কাহিনী জুড়ে প্রবাহিত হয়েছে। উপন্যাসটির শুরুতে আছে ঈশমের যাত্রা এবং শেষে তার প্রিয় শখের তরমুজ লতার ভিতরে ঘটেছে তার মৃত্যু। ঠাকুরবাড়ির অন্নে, স্নেহে, যত্নে মানুষ হয়েছে ঈশম; সে হিন্দু কি মুসলমান এ নিয়ে মাথা ঘামাবার অবকাশ পায়নি। কাজের মধ্য দিয়েই সে আনন্দ খুঁজে পেয়েছে। কিন্তু একদিন সব স্বপ্ন ভেঙে তছনছ হয়ে যায়। মানুষ নয়, সেখানে বড়ো হয়ে উঠল জাত; মানবতার প্রশ্ন নয়, বড়ো হল হিন্দু না মুসলমান। অতীন সেই বদলে যাওয়া ইতিহাসের অধ্যায়কেই তুলে ধরেছেন। সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের কথায় অনেকটা এইরকম—পথের পাঁচালীর পর এই হচ্ছে দ্বিতীয় উপন্যাস যা বাংলা সাহিত্যের মূল সুরকে অনুসরণ করেছে।

অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের আত্মজীবনীমূলক উপন্যাস হল 'অলৌকিক জলযান' (১৯৭৫)। প্রায় সোওয়া দুই লক্ষ শব্দের সুনিপুন সমারোহে তিনি গড়ে তুলেছেন এক বিশাল ইমারত, যা শুধু আয়তনে নয়, বহু বৈচিত্র্য বর্ণময় ঘটনায়, নিবিড় রহস্যময়তার এবং চমৎকারিত্বে অসাধারণ। দেশ-ভাগের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার পূর্বাপর সমন্বিত নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে'-র কিশোর নায়ক সোনা উদ্বাস্তু হয়ে এই বাংলায় এসে প্রত্যক্ষ জীবন-সংগ্রামের মুখোমুখি হয়ে শুধুমাত্র বেঁচে থাকার তাগিদে এম. এস মিউল ব্যাংক জাহাজে সবচেয়ে নিচু পদে কোলবয় হয়ে নিযুক্ত হয়েছে। স্বপ্ন ভেঙে গেছে, এখন বর্তমানের সঙ্গে টিকে থাকার লড়াই।

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় (১৯৩৪-২০১২) এই সময়ের একজন বিখ্যাত কথাসাহিত্যিক। 'আত্ম প্রকাশ' (১৯৬৬) তাঁর প্রথম উপন্যাস; স্বাধীনতা পরবর্তীকালের বাঙালি তরুণ-তরুণীর আশা ও বেদনার কথা ব্যক্ত করেছেন এই উপন্যাসে। এছাড়াও তাঁর উল্লেখযোগ্য উপন্যাসগুলি হল—'অর্জুন' (১৯৭১), 'জীবন যে রকম' (১৯৭১), 'আমিই সে' (১৯৭৪), 'গরম ভাত অথবা নিছক ভূতের গল্প' (১৯৭৮), 'সেই সময়' (১ম খণ্ড ১৯৮১, ২য় খণ্ড ১৯৮২), 'প্রথম আলো' (১ম-১৯৯৬, ২য়-১৯৯৭), 'অন্য জীবনের স্বাদ' (২০০০) ইত্যাদি।

সুনীলের উপন্যাসে আছে সমকালের জীবন উত্তাপ। তাঁর উপন্যাস সমাজ-চেতনা ও জীবন-চেতনার ফসল। 'প্রথম আলো'-য় বাংলার সঙ্গে সঙ্গে ত্রিপুরার আখ্যান এসেছে। ১৮৮৩ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৯০৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ভারতের জাতীয়তাবাদ, ত্রিপুরার রাজবাড়ি, পরাধীন বাঙালির হৃদয় যন্ত্রণা এখানে প্রকাশিত হয়েছে। উনিশ শতকের কলকাতার সমাজ জীবন পরিস্ফুট হয়েছে 'সেই সময়' উপন্যাসে। বাংলাদেশের নবজাগরণের বিশ্লেষণ এবং ইতিহাসাশ্রয়ী চরিত্রগুলো যথাযথ ভাবে পরিস্ফুট হয়েছে। দেশ-ভাগের পর পূর্ববঙ্গ এবং পশ্চিমবঙ্গ—দুই বঙ্গেরই সাধারণ মানুষ অনিশ্চিত অন্ধকারের দিকে এগিয়ে গেছে, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় উপন্যাসে সে কথাই বলেছেন।

'পূর্ব পশ্চিম' উপন্যাসে প্রতাপের ব্যক্তিজীবন, শিল্প-সাহিত্য-রাজনীতি খুঁজে পাই। পশ্চিমবঙ্গে প্রতাপের জন্মভূমি, পুকুরের মাছ, খেত-খামার সব হারিয়ে যায়। বাপ-ঠাকুরদার ভিটে মাটি ছেড়ে চলে আসতে হয় অন্য আর এক ভুবনে। পূর্ব পাকিস্তান থেকে ছিন্নমূল মানুষের সেই জবরদখল করা বাড়ি, অসিত বরণের মৃত্যু, বরদাকান্তের মৃত্যুর সঙ্গে পুরাতন সময়ের নিশ্চিত বিদায়ের আভাস, ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার আলোকে উত্তর কলকাতার বৈশিষ্ট্য, নতুন গড়ে ওঠা ঝাঁ-চকচকে দক্ষিণ কলকাতার জনপদ, শিক্ষিতা নাগরিকার পোশাক-পরিচ্ছদ, আচার-আচরণ যেমন একটা সময়ের অনিবার্য পরিবর্তনশীলতার ছবিকে তুলে ধরেছেন তেমনই ওই সময়ের অনিবার্য প্রভাবে কি আশ্চর্যভাবে পাল্টে যাচ্ছে মানুষেরা। জাতপাত, হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক, সাম্প্রদায়িকতা, হিন্দুদের প্রতি মুসলমানদের অহং আচরণ, সৈয়দ বংশজাত মানুষের ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন পিতা সৈয়দ আব্দুল হাকিম সাহেবের হিন্দুদের নিচু জ্ঞান করা এ সব সময়ের দলিলরূপে সুনীলকে কখনো খুশি করেছে—কখনো তিনি নিছক ইতিহাসকার রূপে তার ব্যাখ্যা দিয়েছেন। প্রতাপ, প্রতাপের স্ত্রী মমতা, বুলা, মামুন, মামুনের স্ত্রী ফিরোজা; এদের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না সময়ের দলিল হয়ে আছে।

প্রফুল্ল রায় (১৯৩৪) স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলা তথা ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত মানুষের সমাজ-বিবর্তনের ইতিহাস রচনা করেছেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য উপন্যাসগুলো হল—'পূর্বপার্বতী' (১৯৫৮), 'কেয়া পাতার নৌকা' (১ম-১৯৬৯, ২য়-১৯৭০), 'ধর্মান্তর' (১৯৮৪),

‘রামচরিত্র’ (১৯৮৫), ‘আকাশের নীচে মানুষ’ (১৯৮১), ‘সিন্ধুপারের পাখী’ (১৯৫৮), ‘ভাতের গন্ধ’ (১৯৮১), ‘মানুষের যুদ্ধ’ (১৯৮৩) ইত্যাদি। তাঁর ‘সিন্ধুপারের পাখী’ ১৯৮৩-তে বঙ্কিম পুরস্কার এবং ক্লান্তিকাল ২০০৩ খ্রিস্টাব্দে সাহিত্য আকাদেমি পুরস্কার পায়।

‘পূর্ব-পার্বতী’-তে এসেছে গোষ্ঠী জীবনের কথা। পাহাড়ের অধিবাসীদের জীবনাচরণ, নাগা জীবনের কঠোর বাস্তব ছবি অঙ্কিত হয়েছে। তাদের (নাগাদের) মুখে অভিনব বাংলা সংলাপ বসিয়ে লেখক সম্পূর্ণ অপরিচিত নাগা সম্প্রদায়ের গোষ্ঠী জীবন স্বভাবকে বাঙালি পাঠকদের কাছে নতুন স্বাদে উপস্থাপিত করেছেন। ‘কেয়া পাতার নৌকা’-য় উদ্বাস্তু জীবন, প্রেম, সমস্যা, রাজনৈতিক ও সামাজিক সংকট চিত্রিত হয়েছে। বিনুর চোখ দিয়ে লেখক দেখিয়েছেন যুদ্ধ, দাঙ্গা, মন্বন্তর, স্বাধীনতা, দেশভাগ। ‘ভাগাভাগি’ উপন্যাসে একটি হিন্দু পরিবার এবং একটি মুসলমান পরিবারের কাহিনী বিবৃত হয়েছে। চূড়ান্ত পরিণতিতে দেখানো হয়েছে, আলী হোসেনরা ব্রিটিশদের ইন্ডিয়া ছেড়ে পালাতে চায়। আর এই সুযোগে মুসলমানদের একটা আলাদা রাষ্ট্রের দাবী উঠে আসে। তখনই গোলমাল বেধে গেল দুই পরিবারে। এরপর দাঙ্গা, ফলস্বরূপ বাংলা দ্বিখণ্ডিত হয়ে যায়।

প্রফুল্ল রায়ের ‘রাম চরিত্র’ উপন্যাসে আঞ্চলিক উপন্যাসের নানা লক্ষ্মণ রয়েছে। অধ্যাপক সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় ‘উনিশ বিশের কড়চা’ গ্রন্থে এ বিষয়ে আলোকপাত করেছেন। প্রফুল্ল রায় এই উপন্যাসে যে অঞ্চলকে বাংলা উপন্যাসে ব্যবহার করলেন সেখানকার মানুষের মধ্যে জাতপাতের সমস্যা, আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতি, মানুষের শ্রেণিবিন্যাস প্রত্যক্ষভাবে দেখেছেন এবং সহানুভূতির সঙ্গে তুলে ধরেছেন।

‘আকাশের নীচে মানুষ’ উপন্যাসটির পটভূমিতে রয়েছে রাঁচির নিকটবর্তী গারুদিয়া অঞ্চল। এই খোলা আকাশের নীচে জমি অনেক থাকলেও সাধারণ মানুষের ভাগ্যে জোটে নামমাত্র জমি। ‘পদ্মা নদীর মাঝি’ উপন্যাসে কেতুপুর অঞ্চলের বাসিন্দারা যেমন ভাবে মাথা গুঁজেছেন ঠিক একইভাবে ঘরের পিঠে ঘর বানিয়ে এলাকার মানুষেরা আশ্রয় নিয়েছেন। জমিদারি প্রথা উঠে গেলেও বেনামে জমি করায়ও করে রাখে এলাকার অধিপতিরা। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে, উঁচু জাত বনাম নিচু জাত। অর্থাৎ মানবতার অপমানই রূপায়িত হয়েছে এই উপন্যাসে।

দেবেশ রায় পঞ্চাশের দশকের বাংলা কথাসাহিত্যের একজন অন্যতম প্রতিনিধি স্থানীয় ব্যক্তিত্ব। উপন্যাস রচনার ক্ষেত্রে তিনি যেমন নানা পরীক্ষায় ব্রতী হয়েছেন ঠিক তেমনই ভাবে উপন্যাসের তাত্ত্বিকতাকে অনেকটা স্বচ্ছ করেছেন। উপন্যাসের ফর্ম সম্পর্কে তিনি নিজেই বলেছেন—"ঔপন্যাসিকের অভিজ্ঞতা বা জ্ঞানকে যা উপন্যাসে পরিণত করে সেটাই তো কর্ম। প্রায় চল্লিশ বছর ধরে গল্প-উপন্যাস লেখার নানা চেষ্টায় বার বার হয়তো এখানেই ঠেকে গেছি। ঠেকে যে গেছি তাও হয়তো সব সময় বুঝিনি, বুঝি না। যখন যখন নিজের অতীতটাকে একসঙ্গে দেখার মতো চড়াইয়ের দিকে চলেছি আর সেই চড়াই থেকে যতই চোখের সামনে বাংলা উপন্যাসের সমতল বিস্তৃততর হচ্ছে, ততোই অসহায় ও ক্ষমতাহীন ক্ষোভ বুঝতে পারছি—ইউরোপীয় মডেল আমাদের পরিত্রাণ নেই।"[৪]

তাই তিনি সর্বদাই নিজস্ব আঙ্গিকে উপন্যাস রচনার চেষ্টা করেছিলেন। দেশ ভাগ, উদ্বাস্তু সমস্যা, দুর্ভিক্ষ, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালের উত্তেজনা, নতুন মূল্যবোধ পঞ্চাশের দশকের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। নির্মম এবং জটিল বাস্তব অনুভবের গাঢ়তায় নির্মিত হয়েছে তাঁর কাহিনী বা আখ্যান। তাঁর রচনার মূল বিষয় মানুষ; নাগরিক ও গ্রাম্য উভয় স্তরের মানুষ। দেবেশ রায় সর্বাধিক অনুপুঙ্খ তথ্যসহ ঘটনার বর্ণনা দিয়েছেন; যার জন্য চরিত্রগুলি হয়ে উঠেছে সজীব। তিনি এক বিশিষ্টরূপে মানুষের কথা ভাষারূপ দিয়েছেন। অধ্যাপক তপোধীর ভট্টাচার্য দেবেশ রায় সম্পর্কে বলেছেন—"তিনি উপন্যাসের মনোরঞ্জন ও ইচ্ছা পূরণের ধরনকে আমূল পাল্টে দিয়েছেন। অজস্র অন্তর্বয়ণে অনেকার্থ দ্যোতনার প্রতিষ্ঠা অনেক সহজ বলে তিনি নির্দ্বিধায় বিচিত্র উপাদানের সংশ্লেষণ করে গড়ে তুলেছেন প্রতিবেদনমূলক উপন্যাসের আদল। এতে মনন ও অনুভূতি, বাস্তব ও কল্পনা দ্বিবাচনিক ঐক্যে বিধৃত। আর, বাংলা সাহিত্যের সীমান্ত এতে প্রসারিত হয়ে স্বতন্ত্র ও সমান্তরাল ভারতবর্ষের উপস্থিতিকে উপন্যাস-গ্রন্থনার আধেয় করে নিয়েছে।"[৫]

প্রতিভাবান এই ঔপন্যাসিকের জন্ম বাংলাদেশের পাবনা জেলার বাগমারা গ্রামে ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দে। পিতা ক্ষিতীশচন্দ্র রায়, মাতা অপর্ণা, পিতামহ উমেশচন্দ্র রায়। ১৯৫৫ খ্রিস্টাব্দে ছাত্র জীবনে 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত হয় তাঁর প্রথম গল্প 'হাঁড়কাটা'। তিনি দীর্ঘদিন 'পরিচয়' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। তাঁর প্রথম উপন্যাস—'যযাতি'। দেবেশ রায়ের উল্লেখযোগ্য

উপন্যাসগুলো হল—'আপাতত শান্তি কল্যাণ হয়ে আছে' (১৯৭৯), 'যযাতি' (১৯৭৩), 'মানুষ খুন করে কেন' (১৯৭৬), 'মফস্বলী বৃত্তান্ত' (১৯৮০), 'বেঁচে বততে থাকো' (১৯৮৪), 'আত্মীয় বৃত্তান্ত' (১৯৯০), 'খরার প্রতিবেদন' (১৯৯১), 'ইতিহাসের লোকজন' (১৯৯২), 'উপদেশ বিদেশ' (১৯৯৩), 'সময় অসময়ের বৃত্তান্ত' (১৯৯৩), 'লগন গান্ধার' (১৯৯৫), 'তিস্তাপারের বৃত্তান্ত' (১৯৮৮), 'তিস্তা পুরাণ' (১৯৯৭), 'বরিশালের যোগেন মণ্ডল' (২০১০) ইত্যাদি।

'যযাতি' থেকে তাঁর উপন্যাস লেখার যে ধারাটি তিনি প্রবর্তন করেছেন তাতে দেখা যায় প্রতিটি উপন্যাসের বিষয় যেমন আলাদা, তেমনই আলাদা উপস্থাপনের ভাষাও। তিস্তাপারের মানুষের জীবন বৃত্তান্ত হল 'তিস্তাপারের বৃত্তান্ত'। আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির হস্তক্ষেপে প্রাকৃতিক পরিবেশের বদলে যাওয়া এবং ফলস্বরূপ মানুষের জীবন প্রবাহের পরিবর্তন এই উপন্যাসের মধ্য দিয়ে দেখানো হয়েছে। 'তিস্তাপারের বৃত্তান্তে'-র মতো তাঁর আর একটি মহাকাব্যিক উপন্যাস হল—'তিস্তাপুরাণ'। দুটি উপন্যাসের সময়ের ব্যবধান ২০ বছর। এই উপন্যাসে পুরাণের মতোই তিস্তাপারের মানুষের জন্ম-মৃত্যু-বিবাহ, বংশ বর্ণনা, দৈনন্দিন খাদ্যাভ্যাস, পার্বণ, রীতি-নীতি, গান, ছড়া, ফাকালী, ছিলকা, প্রবন্ধ, রসরসিকতা, রাজনীতি ও বিভিন্ন চরিত্রের বর্ণনা আলোচিত হয়েছে।

এই সময়ের আরও একজন খ্যাতনামা কথাসাহিত্যিক শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়। তিনি জন্ম গ্রহণ করেন বর্তমান বাংলাদেশের ময়মনসিংহে ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দের ২রা নভেম্বর। পিতার চাকরি সূত্রে শীর্ষেন্দু বাল্য ও কৈশোর উত্তরবঙ্গ, আসাম, বিহার বিভিন্ন জায়গায় গিয়েছেন এবং দেখেছেন সেখানকার সাধারণ মানুষকে। তাঁর উপন্যাসের মধ্যে ঘুরে ফিরে এসেছে আধুনিক বিচ্ছিন্নতাবাদী সমাজের একাকীত্ব, হতাশা, যন্ত্রণা; যা সিরাজের উপন্যাসের মধ্যেও লক্ষণীয় বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় বহু উপন্যাস রচনা করেছেন, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য উপন্যাসগুলি হল—'ঘুন পোকা' (১৯৬৭), 'উজান' (১৯৭১), 'পারাপার' (১৯৭১), 'মানব জমিন' (১৯৮৮), 'যাও পাখি' (১৯৯৩), 'পার্থিব' (২০০১) ইত্যাদি। প্রতিভাবান এই কথাসাহিত্যিক ১৯৮৯ খ্রিস্টাব্দে সাহিত্য আকাদেমি পুরস্কার পান।

তাঁর প্রথম উপন্যাস 'ঘুণ পোকা'-ই তাকে প্রতিষ্ঠা দান করে। এই উপন্যাসের নায়ক জীবনে তথাকথিত সুখ পেয়েও বেঁচে থাকার মানে খুঁজে পায়নি। নায়ক শ্যাম আমাদের মধ্যবিত্ত অস্তিত্বের সংকটকে নগ্নভাবে দেখিয়ে দিয়েছে। লেখকের ভাবনায় বিচ্ছিন্নতার ভবিষ্যৎ, মূল্যবোধের অপচয় আমাদের ভাবিয়ে তোলে। এই উপন্যাসের মধ্য দিয়ে আধুনিক বিচ্ছিন্নতাবাদী সমাজের একাকীত্ব, হতাশা, যন্ত্রণার কথা উঠে এসেছে।

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ উপন্যাসগুলির মধ্যে অন্যতম হল 'যাও পাখি'। এই উপন্যাসে প্রধান চরিত্র ব্রজ গোপাল ও ননীবালা বিশ্বসংসারের মানুষকে সুখী দেখতে চান। উপন্যাসে ব্যক্তি স্বার্থ নয়, সমষ্টি স্বার্থই বড়ো করে দেখানো হয়েছে। অন্যান্য উল্লেখযোগ্য চরিত্রেরা হল—রণেন, সোমেন, শিলা, ইলা এবং রণেনের স্ত্রী বীণা; তাদেরকে নিয়েই উপন্যাসের ঘটনা স্রোত আবর্তিত হয়েছে।

তাঁর 'উজান' উপন্যাসের মধ্য দিয়ে উঠে এসেছে একান্নবর্তী পরিবারে পুরুষদের নিঃস্পৃহতার কথা, তাদের জীবনযাপনে বাউণ্ডুলে ও ত্যাগী মনোভাবের কথা। একান্নবর্তী পরিবারে ব্যক্তিজীবন বলে কিছু হয় না, যা হয় সবটাই যৌথ জীবনের কথা। অর্থাৎ এই উপন্যাসের মধ্য দিয়ে লেখক একান্নবর্তী পরিবারের ভালো-মন্দ এবং পরিণতিতে সময়ের সঙ্গে খাপ খেয়ে চলা জীবনকথা তুলে ধরেছেন।

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের উপন্যাসের মূল চরিত্রগুলি বেশিরভাগই নিম্নবিত্ত পরিবার থেকে উঠে এসেছে। তাদের বেড়ে ওঠা, জীবন-সংগ্রাম অনেক উপন্যাসের মুখ্য বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। ঠিক তেমনই ভাবে 'পার্থিব' উপন্যাসে আমরা দেখতে পাই গ্রামের দরিদ্র ঘরের ছেলে কৃষ্ণজীবন প্রতিভাবলে বিজ্ঞানী হয়েছে। কৃষ্ণজীবন চরিত্রের মানসিক স্তরের বিবরণ লেখক পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে তুলে ধরেছেন। সে শহরে থাকলেও গ্রামকে ভোলেনি, তার বাবা মারা গেলে গ্রামে এসে পুকুরের জলে স্নান করেছে। এই উপন্যাসের বর্ণময় চরিত্রগুলি হল—বিষ্ণুপদ, রামজীবন, নয়নতারা, বীণাপাণি, চারুশীলা, অপর্ণা প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ।

সরোজ কুমার রায়চৌধুরী বাংলা সাহিত্যের আঙিনায় আসেন ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দে। মুর্শিদাবাদ এবং তৎসংলগ্ন এলাকার কথা তিনি তুলে ধরেছেন তাঁর সাহিত্যে। তিনি ছিলেন সচেতন

বাস্তববাদী সাহিত্যিক। তাঁর উপন্যাসে তারাশঙ্করের প্রভাব বিশেষভাবে লক্ষ করা যায়। আধুনিক যান্ত্রিক সমাজের মূল্যবোধের অবক্ষয়কে নগ্নভাবে তুলে ধরেছেন। তাঁর রচনা শৈলীও যথেষ্ট আকর্ষণীয়। সরোজ কুমার রায়চৌধুরীর উল্লেখযোগ্য উপন্যাসগুলি হল—'বন্ধনী' (১৯৩১), 'শৃঙ্খল' (১৯৩২), 'গৃহকপোতী' (১৯৩৭), 'সোমলতা' (১৯৩৮), 'ক্ষুধা' (১৯৪৪), 'কালো ঘোড়া' (১৯৪৬), 'অনুষ্টুপ ছন্দ' (১৯৫১), 'নাগরী' (১৯৬১), 'নীল আগুন' (১৯৬৩) ইত্যাদি।

তাঁর 'অনুষ্টুপ ছন্দ' উপন্যাসের নায়িকা সৌদামিনী। সৌদামিনীর বাবা শিবশংকর, ঠাকুরদা কালীশংকর। অন্যদিকে রয়েছে তার শ্বশুর প্রসন্ন, শাশুড়ি তরঙ্গিণী। সব কিছু নিয়ে একটি রক্ষণশীল সমাজের পরিচয় উপন্যাসে পেয়েছি। সমাজের পরিবর্তনকে প্রত্যক্ষ করেছে ন্যায় পঞ্চানন। সৌদামিনীর স্বামীর নাম প্রণব; তার জীবনে আবর্তিত হয়েছে সৌদামিনী, সুচরিতা, অরুণার ভালোবাসা। সন্তান জন্ম দিতে গিয়ে সৌদামিনী মারা যায়। তাঁর 'কৃশানু' উপন্যাসে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের কথা ব্যক্ত হয়েছে। শ্রী, ব্রততী, শুভেন্দু, ভুজঙ্গ ইত্যাদি চরিত্র স্বাধীনতা সংগ্রামের উত্তাপের সাথে জড়িয়ে পড়েছে। 'নীল আগুন' উপন্যাসে উদ্বাস্তু সমস্যা, গৃহহারা মেয়েদের করুণ আখ্যান বর্ণিত হয়েছে। 'কালো ঘোড়া' উপন্যাসে যুদ্ধ পরবর্তী কলকাতার অবস্থা বর্ণিত হয়েছে। এই উপন্যাসের গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র শ্রীমন্ত।

মহাশ্বেতা দেবী বাংলা কথাসাহিত্যে একজন অন্যতম ব্যতিক্রমী রচনাকার। তিনি ১৯৫৬ সালে 'সুমিত্রা দেবী' ছদ্মনামে 'সাপ্তাহিক সচিত্র ভারতে' লেখা শুরু করেন। ঐ একই সময়ে 'দেশ' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয় 'ঝাঁসির রাণী' জীবনীগ্রন্থ। তাঁর রচিত অন্যতম উপন্যাসগুলি হল—'নটী' (১৯৫৭), 'মধুরে মধুরে' (১৯৫৮), 'এতটুকু আশা' (১৯৫৯), 'তিমির লগন' (১৯৫৯), 'তারার আঁধার' (১৯৬০), 'বায়স্কোপের বাক্স' (১৯৬০), 'রূপরেখা' (১৯৬০), 'লায়লী আশমানের আয়না' (১৯৬১), 'অমৃত সঞ্চয়' (১৯৬২), 'অরণ্যের অধিকার' (১৯৭৭) ইত্যাদি।

মহাশ্বেতা দেবীর 'নটী' উপন্যাসের কাহিনী আরম্ভ হয়েছে মোতির মা রোশনের মধ্য দিয়ে। রোশন নিজের প্রেমের বিস্তার খুঁজতে গিয়ে দু-বছরের মেয়ে মোতিকে রেখে মারা যায়। পরবর্তীকালে এই মোতি ঝাঁসির রাজদরবারে নর্তকীর পেশা গ্রহণ করে। মোতির সাথে যুক্ত হয়

সৈনিক খুদাবক্স। তাই দেখা যায় রাজনর্তকী ও সৈনিকের প্রেমের ভেতর দিয়ে কাহিনী এগিয়ে যায়। খুদা বক্সের মৃত্যুর পর তার দায়িত্ব হাতে নেয় মোতি এবং যুদ্ধে তারও মৃত্যু ঘটে। এর মধ্য দিয়ে ঔপন্যাসিক ব্যক্তি প্রেমকে স্বদেশ প্রেমে উত্তীর্ণ করেছেন।

তিনি নৃত্যশিল্পীদের নিয়ে 'মধুরে মধুরে' নামে একটি অসামান্য উপন্যাস রচনা করেছেন। এই উপন্যাসের কাহিনীর কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে সাধন, রাধা এবং বৃন্দা। চরিত্রগুলির ভৌগোলিক বিস্তৃতি দেখানোর জন্য লেখিকা বিভিন্ন জায়গা থেকে তাদের নির্বাচন করেছেন। যেমন—চট্টগ্রামের সাধন, প্রবাসী বাঙালি রাধা এবং বৃন্দাকে নির্বাচন করেছেন মধ্য ভারতের দেশীয় রাজ্যের কুমার বাহাদুরের কন্যা হিসেবে। মধ্যযুগের বাউল সাহিত্যের মতোই বাউণ্ডুলে চরিত্রদের উপন্যাসে নিয়ে এলেন মহাশ্বেতা। এই সব চরিত্রের টানাপড়েন, আপদ-বিপদের কথা নিখুঁতভাবে উপন্যাসে উঠে এসেছে। শিল্পের জন্য জীবন-মরণ সমর্পণ করতে পারেনি বলে বৃন্দাকে একসময় চলে যেতে হয়; কিন্তু জীবন ও শিল্পের মাঝে সামঞ্জস্য করে রাধা এগিয়ে চলে। উপন্যাসে সাধনের মৃত্যু ঘটেছে কিন্তু এর মধ্য দিয়ে আমরা মানুষের জীবনকে নানা রূপে চিনতে পারি।

বিচিত্র অভিজ্ঞতা নিয়ে মহাশ্বেতা উপন্যাসকে নানা রঙে, নানা ভাবে আমাদের কাছে উপস্থাপিত করেছেন। সার্কাসের শিল্পীদের কথাও তিনি উপন্যাসে তুলে এনেছেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য উপন্যাস 'প্রেম তারা'-তে দেখা যায় ৫ বছরের মেয়ে প্রেমতারা বাবার হাত ধরে সার্কাস দেখতে এসেছিল। প্রেমতারার প্রথমে ভয় হয় এবং ভয় ভাঙতে ভাঙতে সে সার্কাস দেখেছে। তার অনুভবে উঠে এসেছে শিল্পের কথা, একজন মানুষকে নানা শিক্ষাদীক্ষা আর সাধনার মধ্যে দিয়ে যেতে হয়—এটাই সার্কাস। মহাশ্বেতা গড়িয়ে চলা শিল্প মাধ্যম ও তার ভেতরের চরিত্রগুলি নিয়ে উপন্যাসের ভিত্তিভূমি নির্মাণ করেছেন। ভূমিতে যোগ দেয় প্রেমতারা। এই উপন্যাসের উল্লেখযোগ্য চরিত্রগুলি হল—মনোহর, মালিক গোপী, প্রেমতারা এবং ট্রেনিং দেওয়া বাঘ বাদশা।

বাংলা উপন্যাস সাহিত্যে এক স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব মহাশ্বেতা। তাঁর 'এতটুকু আশা' উপন্যাসের মধ্য দিয়ে উঠে এসেছে নিম্ন মধ্যবিত্তের বিত্তবান হয়ে ওঠার স্বপ্ন ও বাস্তবতার কথা; বলাই ও

সুধীরের চাওয়া পাওয়া ভেতর দিয়ে সে কথাই তুলে ধরেছেন। পরবর্তী উপন্যাস 'তিমির লগন'-এ দেখতে পাই চরিত্রদের উচ্চবিত্তদের জগতকে জানার চেষ্টা; নিশীথ, বাসবী, রজত ও মালতীর মধ্য দিয়ে তিনি সেই আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করেছেন। প্রায় একই রকম বিষয় দেখতে পাই 'বায়স্কোপের বাক্স' উপন্যাসে। এই উপন্যাসে উচ্চবিত্ত পরিবারের মহিলা শেলী মাসির নিজস্ব ভাষার মধ্য দিয়ে। অর্থাৎ এই উপন্যাসগুলিতে দেখা যায় চেনা পথ থেকে অচেনাতে চলার কথা।

মহাশ্বেতা দেবীর 'অরণ্যের অধিকার' উপন্যাসটি প্রকাশিত হয় ১৯৭৭ সালে। লেখিকা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা অবলম্বনে এই উপন্যাসের ভিত্তিভূমি গড়ে তুলেছেন। আমরা জানি ১৮৫০ সালের কাছাকাছি সময় থেকেই আদিবাসীদের মধ্যে প্রতিবাদী চেতনা গড়ে উঠতে থাকে। এই সময়ে দেশি ও বিদেশী শোষকদের বিরুদ্ধে মুণ্ডারা বিক্ষোভ শুরু করে। সাঁওতাল বিদ্রোহ তাদের আদর্শ হয়ে ওঠে। আদিবাসীরা ধীরে ধীরে শক্তি সঞ্চয় করতে থাকে; ভাতের স্বপ্ন তাদের আরও বেশি আলোড়িত করে। বীরসা মুণ্ডা যখন এই বিক্ষোভে যুক্ত হয়; তখন এই বিক্ষোভ বিদ্রোহের রূপ নেয়। বীরসাকে জেলখানায় পরিকল্পিত ভাবে মেরে ফেলা হয়।

'অরণ্যের অধিকার' উপন্যাসটি গড়ে উঠেছে ইতিহাসের একটি বিশেষ লগ্নকে নিয়ে এবং সেই লগ্নের নায়ক বীরসা। এই উপন্যাসের অন্যতম অংশ উপসংহার; বিষয়ের প্রাচুর্য এবং বিস্তার এর অন্যতম বৈশিষ্ট্য। তবে নায়ক চরিত্রটিকে অনেকেই আদর্শায়িত মনে করেছেন। আমাদের সমাজ রাষ্ট্রের যখন ভাঙন ধরেছে, তখন লেখিকা নিজেকেও ভাঙছেন। ষাটের দশকে শাসকদলের প্রতি ক্ষোভ ও ঘৃণা প্রকাশ পেয়েছে সমগ্র দেশবাসীর মনে। বিকল্প আর্থ-সামাজিক ভাবনায় ভাবিত হয়েছে মানুষ।

পঞ্চাশের দশকের একজন অন্যতম কথাসাহিত্যিক বরেন গঙ্গোপাধ্যায়। এই সময়ের বাংলা কথাসাহিত্যের ভাষা ও নির্মাণ রীতিতে পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। দাঙ্গা, দেশভাগ, জীবিকা সংস্থানের সমস্যা, ছিন্নমূল মানুষদের জীবন-জীবিকা—এই সব নিয়ে অনিশ্চিত জীবন। এই জীবনকথাই নিজ অভিজ্ঞতা ও মূল্যবোধের দ্বারা সাহিত্যে তুলে ধরেছেন বরেন গঙ্গোপাধ্যায়। তিনি সাহিত্যের পাঠককে পরিচয় করিয়ে দিলেন সুন্দর বন, জল-জঙ্গল, নিম্নবর্গীয় সমাজের নিত্য সংগ্রামের চিত্রকথা। তাঁর উল্লেখযোগ্য উপন্যাসগুলি হল—'বনবিবির উপাখ্যান' (১৯৭৮), 'নদীর

সঙ্গে দেখা' (১৯৮০), 'সন্ন্যাসী বাওয়ালী' (১৯৮১), 'বাগদা' (১৯৮৯) ইত্যাদি। এই উপন্যাসগুলিতে উঠে এসেছে সুন্দরবন, বাদা অঞ্চল, জল কর, আলাখেরি, নদীকেন্দ্রিক গ্রাম বাংলার জীবনচিত্র।

'বনবিবির উপাখ্যান' উপন্যাসের কাহিনীতে দেখতে পাওয়া যায় বন কেটে বসত করা, অনন্ত জলরাশির মাঝে মানুষের বসবাস এবং তাদের দ্বন্দ্ব, ঈর্ষা, সংস্কার, ধর্মচিন্তা, সংস্কৃতি ও জীবনাচরণের কথা। উপন্যাসের কেন্দ্র ভূমি হল চৌধুরীদের আবাদ অর্থাৎ জলরাশি বেষ্টিত একটি দ্বীপ। এর পাশাপাশি রয়েছে ঘোষ বনের কাহিনী। এই দ্বীপের মানুষদের জীবনে ভয় আছে, মৃত্যু আছে, আছে আনন্দ ও রোমাঞ্চ। হঠাৎ একদিন এই দ্বীপের ভেড়িতে আটকে থাকা একটি নৌকায় বসন্ত রোগাক্রান্ত একজন কিশোরীকে লোকজন দেখতে পায়। কিশোরীকে দেখেই সেখানকার মানুষজন দু-ভাগ হয়ে যায়—একদল তাকে সুস্থ করে তুলতে সেবা-পরিচর্যা করে, অপরপক্ষ কোনো ছলনাময়ী অপদেবীর আগমন ঘটেছে বলে মনে করে। এই পক্ষই মনে করে বন কাটবার আগে বনবিবির পুজো না হওয়ায় অমঙ্গল হয়েছে। এই উপন্যাসে লৌকিক-অলৌকিকের সীমানা একাকার হয়ে গেছে। বরেন গঙ্গোপাধ্যায় দেখিয়েছেন বনবিবির পুজোর সাথে সাথে গান, নাচ, সারেঙ্গী বাজনা নিয়ে রজনী, বিশু, মকবুল, জগন্নাথ, প্রাণকেষ্ট, দীননাথ আনন্দে মত্ত। আবার এরই মাঝে দয়াল ধোঁয়ার কুণ্ডলীর মধ্যে জ্যোতির্ময়ী দেবী দর্শন করেছে বলে মনে করে।

বরেন গঙ্গোপাধ্যায়ের 'সন্ন্যাসী বাওয়ালী' উপন্যাসের বিষয় হয়েছে বাঘ শিকারের কথা; এখানে কোনো জটিল জীবনভাবনা নেই। এই উপন্যাসে উঠে এসেছে সুন্দরবনের বাঘের জীবন কথা, মধু সংগ্রহকারী সমাজের কথা অর্থাৎ অর্থনৈতিক দিক দিয়ে পিছিয়ে পড়া মানুষদের জীবন-সংগ্রামের কথা। উপন্যাসের কথক সন্ন্যাসীচরণ বাওয়ালী, সদাশিব বাওয়ালীর পুত্র। তারা মূলত বাঘ শিকারি। লেখক এই উপন্যাসের মধ্যদিয়ে সুন্দরবনের সমাজ, বাঘের মনস্তত্ত্ব, সাধারণ মানুষের আকাঙ্খার কথা সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন। কথক নিজের হাতে ন-বার বাঘ মেরেছে, অনেকবার বাঘের সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে জঙ্গলে ঢুকেছে। তার বাবাও ছিল বাঘ শিকারি। এভাবেই বাঘ শিকারের কাহিনী অগ্রসর হলেও একটি বাঘের আক্রমণে সন্ন্যাসীর হাত

দুর্বল হয়ে যায়। সন্ন্যাসী জঙ্গলের হাতছানি, বাঘের ইশারা, আকাশের চাঁদ, নদীর স্রোত, কান্না ও ব্যথা নিয়ে জীবন প্রবাহে এগিয়ে চলে।

সুন্দরবনের ভেড়ি অঞ্চলের জীবনধারা ও অর্থনীতির কথা তুলে ধরেছেন বরেন গঙ্গোপাধ্যায় তার 'বাগদা' উপন্যাসের মধ্য দিয়ে। উপন্যাসের কাহিনী গড়ে উঠেছে বাগদা চিংড়ি চাষকে কেন্দ্র করে। বিনোদ, শিবু, বিষ্টু সহ অনেকেই রাতে জলকর পাহারা দেয় এবং ভোর হলেই তাদের বাজারে পৌঁছানোর তৎপরতা থাকে। এখানে লঞ্চ ঘটায় একদল দেহ পসারিণী জায়গা করে নিয়েছে। অর্থাৎ এই উপন্যাসে লেখক ভেড়ি অঞ্চলের সামগ্রিক জীবনগাথা তুলে ধরেছেন। প্রসঙ্গক্রমে উঠে এসেছে ভেড়ি অঞ্চলের দাঙ্গা, ডাকাতি, রাজনীতি, চিংড়ি চাষের পদ্ধতি, কাঁটাতার, দেহ ব্যবসায় যুক্ত মেয়েরা, ব্যক্তি ও শ্রেণি সম্পর্ক; অর্থাৎ সামগ্রিকভাবে জীবন বাস্তবতার চরম দৃষ্টান্ত হয়ে উঠেছে 'বাগদা' উপন্যাস।

বরেন গঙ্গোপাধ্যায়ের 'নদীর সঙ্গে দেখা' উপন্যাসে দেখানো হয়েছে শিবনাথ চরিত্রের জীবন অভিজ্ঞতা লাভের কথা। সে মেদিনীপুরের চন্দনতলা থেকে গাইগাছার পাশের গ্রাম গোশিঙায় কৃষক সম্মেলনে যোগ দিয়েছেন। ঘটনাক্রমে সে গাইগাছায় বৃদ্ধ মধুবাবুর বাড়িতে আশ্রয় নেয়; সেখানে ঝড় বাদলের রাতে মধুবাবুর স্ত্রী ফুল্লরার আকর্ষণে এবং অপ্রতিরোধ্য দেহের তাগিদে তারা আত্মসমর্পণ করে। মধুবাবুর বাড়ির পাশে ধু ধু মাঠ, তারপর নদী এবং জঙ্গল। হঠাৎ করে তারা দেখতে পায় নদী প্রকাণ্ড ফেনা নিয়ে এগিয়ে আসছে, সাথে সাথে মানুষের চিৎকার, কান্না, আতঙ্ক। এই জল বাড়তে শুরু করলেই ভেসে যাবে তাদের গ্রাম। এবং শেষে শিবনাথের ঘরে ফেরার অগ্রসর হবার মধ্য দিয়ে উপন্যাস পরিণতি পেয়েছে।

এই সুন্দরবন কেন্দ্রিক উপন্যাসগুলি ছাড়াও বরেন গঙ্গোপাধ্যায় নগর জীবন নিয়ে কিছু উপন্যাস রচনা করেছেন। যদিও এই উপন্যাসগুলি তাঁর যথার্থ অভিজ্ঞতার ফসল নয় তবুও উপেক্ষা করা যায় না। এইসব উপন্যাসের মধ্য দিয়ে তিনি জীবন ভাবনার বিশেষ বিশেষ দিক তুলে ধরেছেন। এই ধারার উপন্যাসগুলি হল—'কলকাতা কলকাতা' (১৯৭৬), 'অসতী' (১৯৮০), 'ঘাতক' (১৯৮২), 'ফাঁদ' (১৯৯১) ইত্যাদি।

বরেন গঙ্গোপাধ্যায়ের ‘কলকাতা কলকাতা’ নগরকেন্দ্রিক উপন্যাসের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে গোপাল; তাকে কেন্দ্র করেই কাহিনী আবর্তিত হয়েছে। গতিশীল কলকাতার জীবনে এসে গোপাল স্ট্যাচু হয়ে যায়। পারিবারিক দায়বদ্ধতা, দায়িত্ব তার স্বাধীন জীবনের স্বপ্নময় গতির পথে বাঁধার সৃষ্টি করে। গোপাল জীবনের অসংলগ্নতাকে কিছুতেই কাটিয়ে উঠতে পারে না; আবার ফিরেও আসতে পারে না সুস্থ স্বাভাবিক জীবনে। কলকাতা আর গোপাল যেন পরস্পর বিরোধী।

তাঁর একটি অন্যতম উপন্যাস হল ‘অসতী’। এই উপন্যাসের কাহিনীর উৎসস্থল দুলালের চায়ের দোকান। দুলাল বাধ্য হয়ে পুলিশের ইনফরমার হয়। খবর সংগ্রহ করার জন্য দুলাল জগদীশের ঘনিষ্ঠ হয় কিন্তু কোনো খবর সংগ্রহ করতে পারে না। অপরদিকে জগদীশ খুন হয়। এই ঘটনার জন্য সিনেমা থেকে ফেরার পথে দুলালের স্ত্রী আরতির সামনেই কিডন্যাপ হয়। এক নির্জন ডেরায় নিয়ে গিয়ে জগদীশের লোকেরা জেরা করতে থাকে; পুলিশের ইনফরমার অভিযোগে সে মার খায়। স্বামীকে বাঁচাতে আরতি পিছন পিছন যায় এবং নিজেকে জামিন রেখে স্বামীকে মুক্ত করে এই শর্তে যে সে তিনদিন তাদের সাথে থাকবে। এই সময়কালে দুলাল স্ত্রীকে বাঁচাতে পুলিশের সাহায্য নেয়নি। তিনদিন বাদে ফিরে এসে আরতি স্বামীর কাপুরুষতা, আত্মগ্লানি এবং সর্বোপরি নির্যাতন ও অত্যাচারে নিজেকে গুটিয়ে ফেলে। এখানেই ঔপন্যাসিক আরতির মানসিক স্তরের মনস্তাত্ত্বিক বিবর্তন ঘটিয়েছেন।

বরেন গঙ্গোপাধ্যায়ের একটি অন্যতম উপন্যাস হল ‘ঘাতক’। এই উপন্যাসে রেবতীর স্ত্রী সুলতার আত্মহত্যার ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। কাহিনীর বিন্যাসে লেখক দেখিয়েছেন সুলতা-রেবতীর প্রণয়, বিবাহ, সুলতার অসুস্থতা ও চিকিৎসা, কাজের মেয়ের স্বভাব ও কাজকর্ম এবং শেষে সুলতার আত্মহননের কথা। সুলতার দাদা, রেবতীর বন্ধু নিখিল সন্দেহবশত সুলতার হত্যাকারীকে শাস্তি দেয়। শেষপর্যন্ত জায়ার মিথ্যা সাক্ষ্য ও পোস্টমর্টেম রিপোর্ট রেবতীর বিপক্ষে চলে যাওয়ায় তার ফাঁসির আদেশ হয়—এখানেই উপন্যাস শেষ হয়েছে।

তাঁর ‘ফাঁদ’ উপন্যাসে চমৎকারভাবে পরিবেশিত হয়েছে ছাপাখানার কর্মচারীদের সঙ্গে মালিকের বিরোধের পরিণতিতে ছায়া নামে এক প্রেস কর্মীকে ফাঁদে পড়ে প্রাণ হারাতে হয়। ছাপাখানার অন্ধকারে সামান্য বেতনের বিনিময়ে যারা জীবিকা নির্বাহ করে তারা বিভিন্ন শ্রেণির

চাপে জীবন অতিবাহিত করে। এই উপন্যাসের মধ্য দিয়ে লেখক দেখাতে চেয়েছেন সাধারণ কর্মচারীদের স্বপ্ন ও স্বপ্ন ভঙ্গের ইতিহাসকে; দেখিয়েছেন মালিকের অনৈতিকতা ও নীতি বিরুদ্ধতাকে। এই উপন্যাসে লেখক তুলে ধরেছেন যে মালিক কেবল ফাঁদ পাতে না, ফাঁদ পাতে সংগঠন, ট্রেড ইউনিয়ন, লম্পট স্বামী অর্থলোভে নিজের স্ত্রীকে পর্যন্ত হত্যা করার জন্য ফাঁদ পাতে।

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের সমসাময়িক আরও একজন বিখ্যাত কথাসাহিত্যিক হলেন মতি নন্দী। 'বেহুলার ভেলা' (১৯৫৮) উপন্যাস নিয়ে তিনি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। পেশায় ক্রীড়া সাংবাদিক হওয়ায় তার সাহিত্যে ক্রীড়া জগতের বিচিত্র আখ্যান পরিবেশিত হয়েছে। তাঁর উল্লেখযোগ্য রচনাগুলি হল—'স্ট্রাইকার' (১৯৭২), 'স্টপার' (১৯৭৪), 'কোনি' (১৯৭৫), 'দ্বিতীয় ইনিংসের পর' (১৯৮০), 'অপরাজিতা' (১৯৮০), 'সাদা ঘাম' (১৯৯০), 'মালবিকা' (১৯৯১) ইত্যাদি।

মতি নন্দী মানুষের জীবনের একাকীত্বের যন্ত্রণা ও অতীত জীবনের বিচ্যুতির কথা তুলে ধরেছেন 'নক্ষত্রের রাত' (১৯৫৯) উপন্যাসে। এই উপন্যাসটি প্রথমে 'ধুলোবালির মাটি' নামে 'উল্টোরথ' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। উপন্যাসটিতে বাংলাদেশের মধ্যবিত্ত জীবনের ছবি তুলে ধরা হয়েছে। গলিকেন্দ্রিক জীবন, স্বল্প পরিসরে অনেক মানুষের জীবন এবং তাদের সংকীর্ণতা, ভাঙন এই উপন্যাসের উল্লেখযোগ্য দিক। প্রায় একইরকম বিষয় তথা মধ্যবিত্ত জীবনকথা উঠে এসেছে তাঁর 'নায়কের প্রবেশ ও প্রস্থান' (১৯৬৯) উপন্যাসে। কাহিনীর কেন্দ্রবিন্দুতে দেখানো হয়েছে গ্রামের ছোট্ট গলিতে সিনেমার নায়কের আগমনে মানুষদের মধ্যে সাড়া পড়ে যায়। এই কাহিনীর সাথে যুক্ত হয়েছে খণ্ড কাহিনী হিসেবে কয়েকটি পরিবার, কয়েকটি চরিত্র এবং কয়েকটি প্রশ্ন।

উপন্যাসে কিছু পারিবারিক বিখণ্ডায়নের চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। নায়কের গাড়ি রাখা নিয়ে ঝগড়া, খেলার বল নিয়ে ঝগড়া, টিউবওয়েল বসানো নিয়ে ঝগড়া, মেয়েদের শরীর দেখা এবং তা নিয়ে বচসা অর্থাৎ ক্লেদাক্ত জীবনের একটি নিখুঁত চিত্র ঔপন্যাসিক তুলে ধরেছেন। অরুণ

মুখোপাধ্যায়ের মতে—"আধুনিক জীবনের ট্রাজেডি লুপ্তপ্রায় মানবিক মূল্যবোধের পুন প্রতিষ্ঠার ব্যর্থ প্রয়াস ক্রিয়াশীল।"[৬]

তাঁর উল্লেখযোগ্য উপন্যাসগুলির মধ্যে 'স্ট্রাইকার' অন্যতম। এই উপন্যাসে দেখানো হয়েছে নানা প্রতিকূলতার মধ্য দিয়ে প্রসূন শিল্ড ফাইনালে চান্স পেয়ে গোল দেয়; এইভাবে সে পিতৃ অপমানের শোধ নেয় ও দলকে জয়ী করে। তাকে কেন্দ্র করে লেখক দেখিয়েছেন মানুষের স্বপ্ন, সংগ্রাম, ফুটবলারদের জীবন কথা। অপরদিকে 'স্টপার' উপন্যাসে মতি নন্দী দেখিয়েছেন কমল গুহ তার যোগ্যতাকে প্রমাণ করতে চাইলেও তার ছেলে ফুটবল এবং ফুটবল প্রেমী বাবাকে ঘৃণা করতে থাকে। ঘটনা পরম্পরায় উঠে আসে উত্তেজনা, তার পাশে মানুষ এবং ভাগ্যের সংঘাত। অর্থাৎ লেখক বলতে চেয়েছেন মানুষ-মানসিকভাবে হারতে পারে কিন্তু তাকে ধ্বংস করে ফেলা যায় না। তাই খেলাধুলা শুধু শারীরিক বিষয় নয়; মানসিক ব্যাপারও বটে। উপন্যাসে আরও দেখা যায় খেলোয়াড়দের জীবন প্রসূত অভিজ্ঞতার কথা, তারা জীবনের সেরা সময় পরিশ্রম করে, পড়াশুনা অবহেলা করে খেললেও দলের সাহায্য তেমনভাবে পায় না। যতদিন মাঠে থাকে খেলোয়াড় ততদিনই মনে রাখা এই মানসিকতার কথাই লেখক তুলে ধরেছেন।

'কোনি' উপন্যাসেও মতি নন্দী খেলোয়াড়ের জীবন সংগ্রামের কথা তুলে ধরেছেন। পাশাপাশি উঠে এসেছে ক্লাবগুলির ক্ষমতার লড়াই, গোপন হিংস্রতার কথা। কেন্দ্রীয় চরিত্র কোনির গড়ে ওঠা অর্থাৎ তার ছোট্ট বেলা থেকে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ—এই দীর্ঘ যাত্রাপথ উপন্যাসে আছে। অনেক অসম্ভবকে যে সম্ভব করে তোলা যায় তা মতি নন্দী একাধিকবার বোঝানোর চেষ্টা করেছেন। পাশাপাশি উঠে এসেছে মেয়েদের পারস্পরিক হিংসা, মিথ্যা অপবাদ প্রভৃতির কথা। 'ফেরারি' উপন্যাসেও উঠে এসেছে খেলাধুলার প্রসঙ্গ। উপন্যাসটির শুরুতে দেখা যায় মাঠে প্রিয় দল জিততে না পারায় সমর্থকদের গণ্ডগোল, পায়ে চাপে পিষে মারা যাওয়া ইত্যাদি ঘটনা উঠে এসেছে। মতি নন্দী প্রায় একই বিষয়কে দেখিয়েছেন 'দলবদলের আগে' উপন্যাসেও; এখানে আছে খেলোয়াড়দের দলবল, টাকা নিয়ে ঝগড়া, ব্যবসায়ীদের সক্রিয় অংশগ্রহণ এবং এদের থেকে মুক্ত থাকার চেষ্টা। মতি নন্দীর কথা সাহিত্য সম্পর্কে ক্রীড়া

সমালোচক লীলা মজুমদারের সাথে আমরাও একমত—"বাংলা শিশু সাহিত্যই শুধু নয়, বাংলা সাহিত্যেই মতি নন্দীর একজনও জুড়ি দেখলাম না। গল্পের বিষয়বস্তু শুধু খেলা, ক্রীড়া প্রতিযোগিতা, খেলোয়াড় জীবন, খেলার পরিবেশ আর স্বাভাবিকভাবেই সব খেলাকে ঘিরে বিশাল দর্শক সমাজ তার ভাইতেও বড়ো কথা এ হল মনুষ্যত্বের কাহিনি।"[৭]

পঞ্চাশের দশকে যে সব কথাসাহিত্যিকরা সাহিত্যের অঙ্গনে প্রবেশ করেছেন কবিতা সিংহ তাঁদের মধ্যে অন্যতম। তিনি কয়েক দশক ধরে গল্প, উপন্যাস, কবিতার মধ্য দিয়ে নিজস্ব প্রতিভা ও শৈলীর স্বাক্ষর রেখেছেন। ব্যক্তিজীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতায় ফুটে উঠেছে তাঁর কথাসাহিত্য জগত। যদিও সাহিত্যের বিচিত্র ক্ষেত্রে তাঁর স্বচ্ছন্দ বিচরণ লক্ষ করা যায়। তাঁর উল্লেখযোগ্য উপন্যাসগুলি হল—'সলিল সীতা' (১৯৫৪), 'সোনা রূপার কাঠি' (১৯৫৬), 'পাপপুণ্য পেরিয়ে' (১৯৬৪), 'চারজন রাগী যুবতী' (১৯৭৩), 'পৌরুষ' (১৯৮৪) ইত্যাদি।

সমালোচকদের মতে কবিতা সিংহের বিখ্যাত উপন্যাস হল 'চারজন রাগী যুবতী'। উপন্যাসটি প্রকাশিত হয়েছে ১৯৭৩ সালে। রাগ বিষয়টা যে শুধু ছেলেদের একচেটিয়া নয়; অবলা মেয়েরাও রাগতে জানে তার কথা উপন্যাসে আছে। এছাড়াও উপন্যাসে তিনি তুলে ধরেছেন সেই সময়কার নকশাল আন্দোলনে কলকাতার মনসিক অবস্থা ও মধ্যবিত্ত পরিবারে তার উপর প্রভাবের কথা। উপন্যাসের নায়িকা চুনির তিন সঙ্গিনী সুমনা, বুলান ও রেণু; সুমনা বাদে সবাই নিম্নবিত্ত পরিবারের সন্তান। চুনির মা আবেগের বশে একজন মিস্ত্রির হাত ধরে গৃহ ত্যাগ করে। তার বাবা ঘরে তোলে গোলাপবালা নামী মহিলাকে। এই নতুন মা তার সাথে খারাপ ব্যবহার না করলেও চুনি নিজের করে ভাবতে পারে না। বুলার, রেণু গরীব ঘরের মেয়ে, তাদের দিদি হাসি চাকরি করে সংসার চালায় অথচ তাকে কোনো পাত্রপক্ষ পছন্দ করে না। সুমন সচ্ছল ঘরের মেয়ে হলেও তার মনে দুঃখ আছে কারণ তার বাবা-মা-র মধ্যে ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে। একদিন চারজন ঘুরতে বেরিয়েছে, দিনটিই চুনির চিন্তা স্রোতের মাধ্যমে অতীতের স্মৃতি, আশা-আকাঙ্ক্ষার কথা ফুটে উঠেছে।

কবিতা সিংহ-এর 'পতনের বিরুদ্ধে' উপন্যাসটি রাজনৈতিক উপন্যাস নয়, তবে এখানে রাজনীতি, সমাজনীতির কথা চিত্রিত হয়েছে। উপন্যাসে প্রাক স্বাধীনতা পর্বের রাজনীতির

ইতিবাচক দিক তুলে ধরা হয়েছে। উপন্যাসের নায়ক রবির মনে পড়েছে ছেলেবেলার শিক্ষক অশনিবাবুকে, যিনি পরাধীনতার জ্বালা তীব্রভাবে অনুভব করেছিলেন। রবির পিতাও আগস্ট আন্দোলনে প্রাণ দিয়েছিল অর্থাৎ তার পরিবার ছিল স্বাধীনতা সংগ্রামী। রবির সমসাময়িক প্রজন্মের চোখে স্বাধীনতার তেমন মূল্য নেই। কারণ তাদের মনে হয়েছে স্বাধীন ভারত এক দারিদ্র্য ও দুর্নীতিতে ভরা।

তাঁর 'একটি খারাপ মেয়ের গল্প' উপন্যাসটিতে দেখানো হয়েছে পাপপুণ্যের কথা। নায়ক মধ্যবিত্ত সূর্যের জীবনে দুজন নারী—প্রেমিকা রুমা ধুনী এবং পরবর্তীতে অলকা। সূর্যকে ভুলে রুমা কমলের দিকে মন দিলে তার জীবনে এসেছে অলকা অর্থাৎ লেখিকা একজনের প্রস্থানের সাথে সাথে আর একজনের প্রবেশ ঘটিয়েছেন।

কবিতা সংহের 'পৌরুষ' উপন্যাসটি ভিন্নধর্মী। দেশ আধুনিক প্রযুক্তির দিকে এগোলেও সামাজিক-মানসিক দিক দিয়ে অনেকেই মধ্যযুগীয় প্রথায় পা দিয়ে চলে। হিজড়াদের অস্তিত্ব—নারী না পুরুষ; তারা যে বিধৃত জীবন যাপন করতে বাধ্য হয় তার জন্য প্রকৃতি দায়ী বলে লেখিকার মনে হয়েছে। পাশাপাশি সমাজকেও দায়ী করেছেন। এর সাথে তিনি স্বাভাবিক জীবন যাপনে অভ্যস্ত মানুষদের কাহিনীও যুক্ত করেছেন। এই দুটি প্লটই সমান্তরালভাবে এগিয়ে চলে।

'পাপ পুণ্য পেরিয়ে' উপন্যাসে তিনি বিশেষ রূপে তুলে ধরেছেন পাপ বোধের কথা। কয়েকজন চক্রান্তকারী নায়ককে বুঝিয়েছে তার মৃত্যু আসন্ন এবং প্রেমিকাই তার পক্ষে অশুভ শক্তি হয়ে দেখা দেবে। কাহিনীতেই এই ভ্রান্ত বিশ্বাস আর পাপবোধের বিচিত্র পরিণতির জট উন্মোচন করা হয়েছে। তবে তাঁর উপন্যাসের মেয়েরা ঘরে বাইরে অস্তিত্বের জন্য সর্বদাই সংগ্রাম করতে প্রস্তুত।

আনন্দ বাগচী পঞ্চাশের দশকের অন্যতম শক্তিশালী কথাকার। তিনি একইসাথে কবি ও কথাসাহিত্যিক। আধুনিক যান্ত্রিক সমাজের বিচ্ছিন্নতাবাদী মানসিকতার প্রকাশ ঘটিয়েছেন উপন্যাসে। তাঁর রচনা শৈলীও যথেষ্ট আকর্ষণীয়। দেশভাগ মানুষের জীবনে চরম সংকট এনে দিয়েছে; এই সংকটে লেখক বিধ্বস্ত হয়েছেন। আনন্দ বাগচীর উল্লেখযোগ্য উপন্যাসগুলি

হল—'চক খড়ি' (১৯৫৭), 'বিকালের রঙ' (১৯৫৯), 'রাতের বাসা' (১৯৫৯), 'যাদু ঘর' (১৯৬৩), 'পরমায়ু' (১৯৬৩) ইত্যাদি।

তাঁর প্রথম উপন্যাস 'চক খড়ি' প্রকাশিত হয় ১৯৫৭ খ্রিস্টাব্দে। তিনি শৈশবে কলকাতা দেখেছেন, প্রচুর ভালোবাসা আর অন্তরঙ্গ জীবনের স্বাদের কথাই উপন্যাসে তুলে ধরেছেন। অনেকের কাছে কলকাতা বিপ্লবের উপযুক্ত পটভূমি, কারও কাছে আমোদ প্রমোদ বা কাম ও ভোগের জায়গা। সময় পাল্টে যায়; মহানগরের রাণী বালারা মাটির ঘর ছেড়ে ফ্ল্যাট বাড়িতে উঠে আসে। তাদের কলকাতার জমিদারেরা, ধনবানরা আহ্লাদে কুঠিবাড়িতে তুলে আনে। লেখক এই পাল্টে যাওয়া সময়ের কথা লিপিবদ্ধ করেছেন উপন্যাসে।

তাঁর 'ছায়ার পাখি' উপন্যাসটিও নানা কারণে বিশিষ্টতার দাবী রেখেছে। এই উপন্যাসে ভুল চিকিৎসা এবং তার পরিণামের কথা তুলে ধরা হয়েছে। ডা. নন্দী একটি গ্রামে ডাক্তারি করতে আসেন। তিনি বড়ো হাসপাতালের প্রফেসর এবং বিলিতি ডিগ্রি রয়েছে। লোকে তাকে ধন্বন্তরি বলে মনে করে। তিনিই একবার ভুল করে রোগীকে গলব্লাডারে সার্জারি করার পরামর্শ দেন অথচ একজন জুনিয়র ডাক্তার হওয়া সত্ত্বেও অতীন রোগীর বুক পরীক্ষা করে জানায় গলব্লাডার অপারেশন করার কোনো দরকার নেই কারণ রোগীর নিউমোনিয়া হয়েছে।

আনন্দ বাগচীর একটি অসামান্য উপন্যাস হল 'ফেরা না ফেরা'। এই উপন্যাসে তিনি মানুষের জীবনের নানা ঘোরপ্যাঁচের কথা তুলে ধরেছেন। মানুষের জীবন পথ অনেক বড়ো, ঘুরপাক খেতে খেতে চলতে হয় আগাম কোনো লক্ষ ছাড়াই। প্রত্যেকেই চলতে চলতে একদিন গিয়ে বুঝতে পারে মানুষের ভালোবাসার কথা, নানা সম্পর্কের কথা, আশা-নিরাশার কথা, ব্যথা-বেদনার কথা; এই সম্পর্কগুলি গড়তে গড়তে মানুষের জীবনটাই ক্ষয়ে যায়। উপন্যাসের অন্যতম চরিত্র তপতী ও ধূর্জটি ত্যাগে, আত্মদানে ক্ষয়ে ক্ষয়ে নিজেদের জীবনের মানেটাই হারিয়ে ফেলেছে। এই রহস্যময় সত্যকথা অবশ্যই লেখকের নিজস্ব অনুভবের থেকে উঠে এসেছে।

'বিকালের রঙ' উপন্যাসে দেখানো হয়েছে শোভন-বিনীতার বেদনাময় কাহিনীর অনিবার্য পরিণতির কথা। লেখক মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণে দেখিয়েছেন এক বয়সে যা সম্ভব, আরেক বয়সে তা সম্ভব নয়; এইভাবে জীবনের আকাঙ্ক্ষার পালাবদল উঠে এসেছে। মনস্তত্ত্বের অভিঘাতে বিপন্ন

ঘর সংসার হারিয়েও বিনীতা সংস্কারের দেওয়াল ধরে বাঁচতে চেয়েছে। এই ঘটনাগুলি বানানো বলে ঔপন্যাসিকের প্রতি তথা উপন্যাসের প্রতি সুবিচার করা হয় না। এখানে উজ্জ্বল কুমার মজুমদারের মন্তব্যটি প্রণিধানযোগ্য—"আসলে উপন্যাস লেখক জীবনকে দেখেন, জীবনের বিচত্র স্বাদ পেয়ে বিস্মিত ও উদ্বুদ্ধ হন এবং সেই বিস্ময়ের উদ্বোধনকে অনিবার্য ভাবেই স্বকীয় দৃষ্টিভঙ্গিতে পরিবেশন করতে চান গল্প কাহিনীর মধ্য দিয়ে। এই পরিবেশনায় ঔপন্যাসিকের অবরুদ্ধ আবেগ মুক্তি পেলে তবেই তার তৃপ্তি। জীবনই হল সমস্ত শিল্প সৃষ্টির মৌলিক উপকরণ এবং ঔপন্যাসিক ছাড়া আর কেউই বোধহয় অতটা জীবনের মৌলিক উপকরণের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ নন।"[৮]

সিরাজের সমসাময়িক একজন উল্লেখযোগ্য কথাকার হলেন শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়; তিনি ১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দে বাংলাদেশের খুলনায় জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পেশা ছিল সাংবাদিকতা করা। তিনি 'অমৃত' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন ১৯৭৭ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৯৮৩ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত এবং দৈনিক 'যুগান্তর' পত্রিকার সহকারী সম্পাদক ছিলেন। তাঁর রচিত উল্লেখযোগ্য উপন্যাসগুলি হল—'বৃহন্নলা' (১৯৬১), 'অনিলের পুতুল' (১৯৬২), 'কুবেরের বিষয় আশয়' (১৯৬৭), 'পর স্ত্রী' (১৯৭১), 'সরমা ও নীলকান্ত' (১৯৭২), 'নির্বান্ধব' (১৯৭২), 'ঈশ্বরী তলার রূপোকথা' (১৯৭৬), 'অগস্ত্য যাত্রা' (১৯৭৬), 'আবিষ্কার' (১৯৭৭), 'সাহাজাদা দারাশুকো' (১৯৯১) ইত্যাদি।

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের অন্যতম উপন্যাস হল 'বৃহন্নলা'; পরবর্তীকালে উপন্যাসটির নামকরণ হয় 'অর্জুনের অজ্ঞাতবাস'। উপন্যাসের মধ্য দিয়ে লেখক যুগের সংকটের সাথে সাথে নায়কের সংকটকেও সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন। মধ্যবিত্ত মানসিকতা থেকে রিক্ততাবোধ, অসহয়তাবোধ এবং শেষপর্যন্ত বিচ্ছিন্নতাবোধ উপন্যাসের উপজীব্য বিষয়।

তাঁর রচিত একটি উল্লেখযোগ্য উপন্যাস হল 'কুবেরের বিষয় আশয়'। উপন্যাসটি সাপ্তাহিক 'দেশ' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। এই উপন্যাসের নায়ক কুবের সাধুখাঁ বন্ধুর সঙ্গে বাইজি শেফালীর ঘরে গিয়ে অসুস্থ হয়। তার মনে হয়েছে পাপের জন্যই এই অসুখ। সে স্ত্রীর কাছে গিয়ে নিজের এই পাপবোধের কথা জানিয়ে অনুশোচনা করেছে। উপন্যাসটি যখন রচিত হয় অর্থাৎ বিশ শতকের ষাটের দশকে মধ্যবিত্তদের তথা মধ্যবিত্ত চাকুরীজীবীদের অবস্থা

মোটেই ভালো ছিল না। এই বিষয়গুলি শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় উপন্যাসে তুলে ধরেছেন। 'অনিলের পুতুল' উপন্যাসেও অনিল এবং তার স্ত্রী পুতুলের সাংসারিক জীবনচিত্র তুলে ধরা হয়েছে। পরবর্তী উপন্যাস 'রপোকথা'-তে উঠে এসেছে গ্রামীণ জীবনের কথা এবং এর সাথে যুক্ত করা হয়েছে ঈশ্বরীতলা গ্রামের মানুষজনের কথা, প্রকৃতি ও কীটপতঙ্গের সাথে অনাথবাবু ও তার পারিবারিক জীবনচিত্র। তাঁর প্রায় সব উপন্যাসেই কমবেশি আত্মজৈবনিক উপাদান আছে বলে মনে করেন সমালোচকগণ। তবে আমাদের মনে হয়েছে তিনি বাস্তব ও কল্পনা মিলেমিশে উপন্যাসের জগতটি তৈরি করেছেন। ঔপন্যাসিক নিজেই কখনো উপন্যাসে কুবের আবার কখনো অনাথ হিসেবে উঠে এসেছেন। দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার একটি বিশেষ অঞ্চলের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের কথা তাঁর রচিত কথাসাহিত্যে উঠে এসেছে অথচ আঞ্চলিকতার সাথে এর কোনো যোগ নেই। তিনি রাজনৈতিক প্রসঙ্গও খুব সচেতনভাবেই পরিহার করেছেন।

বাংলা কথাসাহিত্যে দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় একটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ নাম। তিনি ১৯৭৬ খ্রিস্টাব্দে 'পরিচয়' পত্রিকার সম্পাদক হয়েছিলেন। অসামান্য অনুভূতিশীলতায় ঔপন্যাসিক দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলা কথাসাহিত্যে স্বাতন্ত্র্যতার পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর উপন্যাসে উঠে এসেছে সময়ের ক্ষয়িষ্ণু মূল্যবোধ, মধ্যবিত্ত-নিম্ন মধ্যবিত্ত মানুষদের বেঁচে থাকার লড়াই, দেশ বিভাগ ও তার কারণে নানা বিপর্যয়ের কথা। তাঁর রচিত উল্লেখযোগ্য উপন্যাসগুলি হল—'আগামী' (১৯৫১), 'তৃতীয় ভুবন' (১৯৫৮), 'শোক মিছিল' (১৯৭৩), 'বিবাহবার্ষিকী' (১৯৭৬) ইত্যাদি।

দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় আঠারো বছর বয়সে লিখেছেন 'আগামী' উপন্যাসটি। এখানে তিনি মানব জীবনের সমস্যার গভীরে আলো ফেলবার চেষ্টা করেছেন। প্রসঙ্গক্রমে উপন্যাসে উঠে এসেছে দাঙ্গাবাজ মানুষের কথা, স্বার্থান্ধ শক্তির কথা; যারা প্রচার কৌশলের সাহায্যে দাঙ্গা লাগিয়ে দেয়। ছাত্র জীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষার কথা তিনি তুলে ধরেছেন 'তৃতীয় ভূবন' উপন্যাসের মধ্য দিয়ে। এখানে 'জয়তী' নামক একজন তরুণী মেয়ের সাথে আসাদ নামে এক মুসলমান যুবকের সাথে প্রেম সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারের দারিদ্র্যতাকে সঙ্গে নিয়ে জয়তী সকালের স্কুলে শিক্ষিকার কাজ নিয়েছে এবং সে দুপুরবেলা যায় তার নিজের

কলেজে। এখানে তার প্রেম সম্পর্ক গড়ে উঠলে জয়তী বাবা-মা, বড়ো বোনের অসম্মতিতে অসবর্ণ বিবাহ করে বাড়ি ছেড়ে চলে গিয়েছে।

'শোক মিছিল' উপন্যাসে আছে মানব জীবনের বিকারগ্রস্তের কথা। সাম্যবাদী বিনয় ভূষণ এবং পারুলের চোখের সামনে পার্টি দু-টুকরো হয়ে যায়, অনেকেই শহীদ হয়। বিনয়ের সাথে তার পুত্র অজয়ের চলে রাজনৈতিক বিতর্ক। উপন্যাসে এই সংঘাতের চিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন। পরবর্তী উপন্যাস 'বিবাহবার্ষিকী'-তে উঠে এসেছে মণি মোহনের বেদনার কথা।

মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তান দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ছাত্র জীবন থেকে মার্কসীয় সমাজ দর্শনে আকৃষ্ট হয়েছেন। সাধারণ মানুষের প্রতি ছিল তাঁর দরদ, মানুষ হিসেবেও তিনি ছিলেন বন্ধু বৎসল। যে মধ্যবিত্ত জীবন তাঁর চারপাশে প্রবাহিত ছিল সেই সংগ্রামময় জীবনের ভাঙাচোরা, অস্তিত্বের সংগ্রামকে উপন্যাসগুলিতে সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন। তাঁর কথাসাহিত্যে লক্ষণীয় বিষয় হয়ে ওঠে বিশ্ববীক্ষা, জীবনবোধ, ইতিহাস চেতনা। দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহিত্যের আরও একটি লক্ষণীয় বিষয় হল সংলাপ রচনার নতুনত্ব—চরিত্রের শ্রেণিগত, শিক্ষাগত, পরিবেশগত অবস্থানের কথা মনে রেখে তিনি সংলাপ রচনা করেছেন। এগুলির জন্যই তাঁর রচিত সাহিত্যের চরিত্রগুলি জীবন্ত ও বিশ্বাসযোগ্য হয়ে উঠেছে। আবহমান সময়ের স্রোতে নতুন নতুন কালের প্রয়োজন উপলব্ধিতেই মানুষের আসা-যাওয়া; জীবন থাকলে কথকতা থাকবে এবং কথকতা থাকলে দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় থাকবেন। এবার, আমরা উপরিউক্ত ঔপন্যাসিকদের রচনার সাথে সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের সাহিত্যের বিশেষত ঔপন্যাসিক সত্ত্বার স্বাতন্ত্র্য তুলে ধরার চেষ্টা করবো।

নাগরিক মননের আলোকে গ্রাম ভারতবর্ষের চিরন্তন সত্য বার বার মায়া বাস্তবতার রূপ ধরে প্রকাশ পেয়েছে সিরাজের রচনাগুলিতে। 'জানমারি', 'মায়ামৃদঙ্গ', 'অলীক মানুষ', 'অমৃত প্রেমকথা', 'গোপন নির্জনে', 'নিলয় না জানি' ইত্যাদি তারই সাক্ষ্য বহন করে। গ্রাম জীবনের কোনো পারিবারিক গল্প নয়; যা চিরকালীন জীবনের গূঢ় কথন ও প্রকৃতিতে মানুষের চূড়ান্ত অসহয়তার দলিল। অদিপাউস, মার্কস, ডারউইন, ফ্রয়েড, জাং, জোলা, লুসুন, পাভলভ—সবাই একাকার হয়েছেন সিরাজের সাহিত্যে। সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের সাহিত্যকর্মের এটাই বড়ো দিক।

তিনি একে একে তুলে ধরেছেন চলমান স্রোতে দুঃখ-বিচ্ছেদ-বিরহ, প্রেম-ভালোবাসা, পিতৃত্ব, মাতৃত্বের স্নেহবৎসলতা, নৈতিকতার টানে অন্যের সন্তানকে আপন করা, উপেক্ষা-প্রত্যাখ্যানের প্রতিশোধের বাসনা, উদ্দাম যৌবনের ঝড়ে টালমাটাল, বিপরীত লিঙ্গের প্রতি অবিরাম আসক্তির কথা। একইভাবে উঠে এসেছে মিথ, আখ্যান, প্রবাদ-প্রবচন ও লোকজ সংস্কৃতির ধারা। সরীসৃপ, স্তন্যপায়ী, উভচর, পাখপাখালি, যৌনাসক্তি, প্রজনন প্রবাহ মানুষের মননে জাগিয়ে তোলে কামজ আবেদন। 'দেহমনের স্বাদ' আস্বাদনে 'স্বামী ও প্রেমিক'-এর দ্বন্দ্ব, 'বাদশা'-র বাদশাহি মেজাজ, 'রাণীর ঘাটের বৃত্তান্ত'-এ ফালতুর জন্ম বৃত্তান্ত এমনই করেই তিনি ভালোবাসায় মুখরিত পরস্পর নির্ভরতার সম্পৃক্ত জীবন কথা তুলে এনেছেন। 'ফৌজী জুতো' গল্পে বাবুরাম সাহানী খৈনির ব্যবসায় ডুবে জীবনের মানেটাই বুঝতে পারেনি। অর্থাৎ প্রকৃতির আদিমতম চাওয়া-পাওয়ার মায়াবী চরাচরে মানুষের প্রেম-ভালোবাসা, হিংসা-প্রতিশোধ, নৈরাজ্য-নির্লিপ্ততার সার্থক কথাকার সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ।

সুফিতত্ত্ব ও বাউল জীবন দর্শনে সচেতন বাংলা কথাসাহিত্যের অমর কথাকার সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ লিখলেন 'নিশিলতা', 'অমর্ত্য প্রেমকথা', 'উত্তর জাহ্নবী', 'তৃণভূমি', 'গোপনে নির্জনে', 'হিজল কন্যা', 'কিংবদন্তির নায়ক', 'মায়ামৃদঙ্গ' প্রভৃতি উপন্যাসের সাথে উল্লেখযোগ্য ছোটগল্প 'বাগাল', 'সূর্যমুখী', 'গাছটা বলেছিল', 'ভারতবর্ষ', 'বসন্তের বিকেলে ঘুমঘুমির মাঠে', 'বুঢ়া পিরের দরগাতলায়', 'সরাইখানা', 'বাদশা', 'সাক্ষীবট', 'গোঘ্ন', 'স্বামী ও প্রেমিক', 'ডালিম গাছের জিনটি', 'গাজনতলা', 'রাণীর ঘাটের বৃত্তান্ত' ইত্যাদি কালজয়ী ছোটগল্প। এক সময় পাঠককুলকে নাড়িয়ে দিয়েছিল সুবোধ ঘোষের 'ফসিল', মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'প্রাগৈতিহাসিক', 'সরীসৃপ', প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'তেলেনাপোতা আবিষ্কার', অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের 'সারেঙ', নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'রেকর্ড', 'টোপ', সমরেশ বসুর 'আদাব', 'কিমলিশ' ইত্যাদি। বাংলা কথাসাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ত্রয়ী বন্দ্যোপাধ্যায়ের পর বাংলা সাহিত্যে অনেক পরীক্ষানিরীক্ষা চলেছে; সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ তারই ধারক ও বাহক হয়ে উদার উন্মুক্ত আকাশ, ধু ধু মাঠ, রাখাল বালকের বাঁশি, পাহাড় থেকে নেমে আসা নদী, জঙ্গল-গাছপালা, ঝোপঝাড়, জীবজন্তু, কীটপতঙ্গ, পোকামাকড়ের অপূর্ব সমন্বয় ঘটিয়েছেন কথাসাহিত্য। তাঁর লেখার পটভূমিতে উঠে এসেছে বহরমপুর, লালবাগ, ভগবান গোলা, কৃষ্ণপুর, লালগোলা,

ব্রহ্মপুর, হরিণমারা, গঙ্গা-পদ্মা-দ্বারকা-ময়ূরাক্ষী, জলঙ্গি নদী অববাহিকা তথা রাঢ় বাংলার জনজীবন কথা। আমরা 'অলীক মানুষ' উপন্যাসে জানতে পেরেছি রাঢ় বাংলার গ্রামীণ পটভূমিতে সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অভিঘাতের কথা। উপন্যাসটিতে ঘটনাগুলি বর্ণিত হয়েছে ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের পর থেকে ১৯৫৩ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত। এই সময়কালের কোলাজ, সিপাহী বিদ্রোহ, স্বাধীনতা আন্দোলন, বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন, তিতুমিরের বিদ্রোহ, বীরভূম-মুর্শিদাবাদের লোকজ সংস্কৃতি তুলে ধরেছেন।

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ ছোটবেলায় ছিলেন অস্থির প্রকৃতির, বোহেমিয়ান স্বভাব তাকে পেয়ে বসে। ফ্রয়েডীয় মনোবিকলন, পঞ্চ ইন্দিয় ভেদ করে তাঁর ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়ে আঘাত করেছে। মায়ামৃদঙ্গ তাকে অদৃশ্য টান দেয়। তিনি আত্মকথাতে লিখেছেন—"১৯৫০ সালের শেষ দিকে একটা বাঁশের বাঁশি ফিরিয়ে নিয়ে গেল গ্রামীণ মিথের সুপরিচিত জগতে। কাটতে থাকল দিনরাত্রি গাঁয়ে গঞ্জে হাটে বাজারে মেলায়-মেলায়। অজস্র মানুষ দেখলাম—বিচিত্র, বিস্ময়কর সব চরিত্র। মুর্শিদাবাদ বীরভূম মালদা সাঁওতাল পরগণা দুমকা ঘুরে বেড়াই আলকাপ দলে। আড়াই হাজার রাত—ষাট হাজার ঘণ্টা কেটে যায় সৌন্দর্য ও যন্ত্রণার মধ্যে। মেয়েদের হৃদয় ও মুখমণ্ডল বিশিষ্ট তরুণ পুরুষের শরীরে কিংবদন্তির গ্রাম পরিরা কীভাবে অনুপ্রবেশ করে দেখেছি। আলকাপ দলের নাচিয়ে 'ছোকরার' প্রেমে পড়েছি। অচরিতার্থ কামনার জ্বলে মরেছি।"[৯]

'সিরাজ মাস্টার' নামে তিনি আলকাপ দলে পরিচিত ছিলেন। বাদল সরকারের থার্ড থিয়েটার ভাবনাকে সিরাজ আলকাপে মর্যাদা দিয়েছেন। তিনি আলকাপের বিষয় নিয়েই 'মায়ামৃদঙ্গ' উপন্যাসে মায়া-বাস্তবতার এক ইন্দ্রজাল তৈরি করেছেন। পরবর্তীতে তিনি 'নিলয় না জানি' উপন্যাসে ভিন্ন অভিজ্ঞতা দিয়ে আউল-বাউল—পির-ফকির-দরবেশদের কথা নতুনভাবে উপস্থাপন করেছেন। উপন্যাসে মদন চাঁদ ফকিরের গানগুলি অত্যন্ত তাৎপর্যময়। তিনি গেয়েছেন—

"তিরপিনীর ঘাটেতে এক মড়া

ভাসতেছে।

মড়ার বুকে সর্পের ডিম্ব।

হরিণ চরতেছে। ...''[১০]

এর সাথে মিল চর্যাপদের কথার–

''তিন ন বছুপই হরিণা পিবই ন পানী।

হরিণা হরিণির নিলঅ ন জাণী।''[১১]

সিরাজ অভিজ্ঞতা দিয়ে আধুনিক মননের আলোকেই মদনচাঁদ, আবদুল্লা ফকিরের মুখ দিয়ে গুহ্যকথা শুনিয়েছেন। যাকে দার্শনিক ভাষায় বলা হয় Thing in itself বা পরম সত্য বা অবভাসতত্ত্ব; এর মধ্যে উঠে আসে Appearance এবং Reality, মদনচাঁদ প্রসঙ্গক্রমে দার্শনিক ও সুফি সাধক মনসুর হেল্লাজের কথাও বলেছেন। তাঁর মতে–''মনসুর হেল্লাজ ছিলেন পশ্চিম এশিয়ার প্রখ্যাত সুফি দার্শনিক ও সাধক। প্রথম জীবনে ডাকাতি করতেন। পরে সাধুসন্ত হন।''[১২]

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ কথাসাহিত্যের গতানুগতিক প্রচলিত ধারার সম্পূর্ণ বিপরীতে দাঁড়িয়ে একান্ত নিজস্ব ঘরানা প্রতিষ্ঠা করে সভ্যতা-সংস্কৃতির উপরিতলের মায়ার ছলনায় প্রভাবিত না হয়ে প্রকৃত গ্রাম ভারতবর্ষের শিকড়ের সন্ধান করেছেন। তাঁর আধুনিকতার আরও একটি অনবদ্য উপন্যাস 'জানমারি' (১৯৮৯)। গতানুগতিক ধারায় সম্পূর্ণ অচেনা গ্রাম বাংলার চিত্রকল্প ও রূপকল্প হল 'জানমারি' উপন্যাস। এখানে দেখানো হয়েছে সোনারু পাগল নয় অথচ লোকে তাকে পাগল ভেবে মারতে চায়, তাড়া করে। সোনারু চায় এই পৃথিবী থেকে সব রকমের জানমারি বন্ধ হোক; কেউ যেন কারও প্রাণ না নেয়। সেও আর উপলব্ধি করেছে কেউ যেন মাছও না ধরে, পাখি শিকারও না করে, পরবে কোরবানি না দিলে খুব ভালো হবে। এই সোনারু কারও কাছে অপদেবতা আবার মুসলমানদের কাছে ক্ষতিকর জিন। সোনারু ধর্মে মুসলমান হয়েও নিরামিষ ভোজন করে, দুর্গা পূজার সময় হিন্দু পাড়ায় নাচে। সিরাজ লিখেছেন–''তিনি মানুষতার সীমান্ত থেকে পলকে শাস্ত্রে সরে এসে বললেন, 'মসজিদে আওরত লোকের পা দেওয়া

হারাম। তুই খবিস, বুঝিবি না...তুই বেশরা...ওরে শয়তান, তুই হিঁদু সাদুর মতন...শুনেছিলাম, হিঁদুর দুগ্গিচালির ছামুতেও নাচ নেচেছিলি!''[১৩]

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'বৈতানিক'-কে আলকাপের জীবনকথা উঠে এসেছে; সেই হিসেবে সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের 'মায়ামৃদঙ্গ' এই বিষয়ের দ্বিতীয় উপন্যাস। আলকাপ জীবনের কথা অবিমিশ্রভাবে তিনি উপন্যাসে তুলে ধরেছেন। এককথায় আলকাপ হল আমোদ-প্রমোদ মূলক নাটিকা। 'মায়ামৃদঙ্গ' উপন্যাসে সোনা ওস্তাদ জাহান্নামের কথা ভেবেও সুবর্ণর হাত ছেড়ে দেয়নি। সুবর্ণর মেয়েদের মতো চুল, দু-হাতে চুড়ি, নীলচে শার্ট আর পাজামা পরে, পায়ে কাবুলি চপ্পল, ফর্সা মুখের চাপা চিবুক, মসৃণ নিটোল গাল, টানা চোখ—নারী অথচ নারী নয়। আবার পুরুষ হয়েও পুরুষ নয়, নয় তৃতীয় লিঙ্গের। সে এক অমর্ত্য মায়া, সুবর্ণদের নিয়েই দেশে দেশে মৃদঙ্গ বাজে। ওস্তাদ, আলকাপের ঝাঁকসুকে কেন্দ্র করে আশা-নিরাশা, আলো-আঁধার, পাপ-পুণ্য, মায়া-বাস্তবতার অপূর্ব চিত্রণ ঘটেছে উপন্যাসে। সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ মফস্বলীয় জীবনের প্রেক্ষাপটে চিরন্তন মানুষের চাওয়া-পাওয়া, তাদের আপেক্ষিক সুখ-দুঃখ, অবচেতন মনের লিবিডোপ্রবাহ, প্রকৃতির কাছে মানুষের চিরকালীন অসহায়তা, লোককথা, তাদের মিথলজি—সব কিছুকেই তিনি তুলে ধরেছেন। তিনি কলকাতা কেন্দ্রিক সাহিত্যের পরিসর থেকে বেরিয়ে এসে বা তার বিপরীতমুখী বিষয়গুলিকে উপন্যাসে তুলে ধরেছেন। অর্থাৎ বঙ্কিমচন্দ্র থেকে অমিয়ভূষণ মজুমদার পর্যন্ত কথাসাহিত্যের নির্দিষ্ট গণ্ডী থেকে তিনি বেরিয়ে আসতে পেরেছেন।

তথ্যসূত্র

১. সিরাজ, সৈয়দ মুস্তাফা : সাক্ষাৎকার, 'বইয়ের দেশ', অক্টোবর-ডিসেম্বর, ২০০১, পৃ. ১১৮

২. বন্দ্যোপাধ্যায়, অতীন : 'মানুষের ভূমিকা' (গল্প সমগ্র ১), করুণা, ১৪১৪ বঙ্গাব্দ, পৃ. ১৬৩

৩. সিরাজ, সৈয়দ মুস্তাফা : সাক্ষাৎকার, 'বইয়ের দেশ', অক্টোবর-ডিসেম্বর, ১৪১

২০০১, পৃ. ১৩৫

৪. রায়, দেবেশ : 'উপন্যাসের নতুন ধরণের খোঁজে', দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলকাতা-৭৩, কলকাতা পুস্তক মেলা, জানুয়ারি ২০০৬, পৃ. ২১

৫. ভট্টাচার্য, তপোধীর : 'দেবেশ রায়ের প্রতিবেদন-চতুষ্টয়', উপন্যাসের নতুন ধরণ; র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেশন, ৪৩ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-০৯, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি, ১৯৯৯, পৃ. ১৫৩

৬. মুখোপাধ্যায়, অরুণ : কালের প্রতিমা, বাংলা উপন্যাসের পঁচাত্তর বছর : ১৯২৩-১৯৯৭, দে'জ পাবলিশিং, পঞ্চম সংস্করণ, এপ্রিল ২০১০, পৃ. ৩৪৫

৭. মজুমদার, লীলা : আনন্দবাজার পত্রিকা, কলকাতা, ১৬-৯-১৯৯০

৮. মজুমদার, উজ্জ্বল কুমার : উপন্যাসে জীবন ও শিল্প, ১ম প্রকাশ, ৩০ শে শ্রাবণ, ১৩৮৪, পৃ. ৩

৯. সিরাজ, সৈয়দ মুস্তাফা : 'আত্মকথা', সমকালের জিয়নকাঠি, জুলাই-ডিসেম্বর ২০১৩, পৃ. ৩১

১০. সিরাজ, সৈয়দ মুস্তাফা : 'নিলয় না জানি', দে'জ পাবলিশিং, ২০১৫, পৃ. ৪৪১

১১. দাশ, নির্মল : চর্যাগীতি পরিক্রমা, দে'জ পাবলিশিং, ২০০৬, পৃ. ১৩১

১২. সিরাজ, সৈয়দ মুস্তাফা : নিলয় না জানি, দে'জ পাবলিশিং, ২০১৫, পৃ. ৪৩৮

১৩. সিরাজ, সৈয়দ মুস্তাফা : জানমারি, দে'জ পাবলিশিং, ২০১৩, পৃ. ৯৩